Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুহাম্মাদ সা. আমাদের নবি ও নেতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো: ইসহাক উদ্দিন হিমেল

রোলঃ 228011190

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুহাম্মাদ সা. আমাদের নবি ও নেতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো: ইসহাক উদ্দিন হিমেল

রোলঃ 228011190

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুহাম্মাদ সা. আমাদের নবি ও নেতা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মো: ইসহাক উদ্দিন হিমেল, আইডিঃ 228011190 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুহাম্মাদ সা. আমাদের নবি ও নেতা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

মো: ইসহাক উদ্দিন হিমেল

আইডিঃ 228011190

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

যে ফুলের খুশবুতে দুনিয়া মাতোয়ারা 6

নবীয়ে রহমত 6

খাতামুল আম্বিয়া 7

উম্মাহর নেতা 7

প্রধান বিচারক 9

শিক্ষক ও পরিচালক 10

মিলিটারি কমান্ডার 12

কাইন্ডফুল লিডার 17

দ্যা আল্টিমেট লিডার 20

উপসংহার 23

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاه والسلام على رسوله وآله اجمعين

قال الله تعالى في كلامه المجيد -
لقد كان في رسول الله أسوة حسنة

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। (সূরা আহযাব : আয়াত ২১)

যে ফুলের খুশবুতে দুনিয়া মাতোয়ারা

চারদিকে ঘোর অন্ধকার। শিরক, কুফর, ব্যভিচার, অশ্লীলয়তায় দুনিয়া ভরপুর। এটা এমন সময় যখন কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত পুতে ফেলা হতো। কাবাগৃহ মূর্তি দিয়ে ভরপুর করে রেখে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করতো । অথচ এটাকে তারা 'দ্বীনে ইব্রাহিম' মনে করতো । এই দুর্গন্ধময় দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলা এমন এক ফুল প্রেরণ করলেন যার খুশবুতে সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত মাখলুক মুগ্ধ হয়ে পড়লো।

সেই ফুলটি হল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম । যিনি আমাদের নবী ও নেতা।

নবীয়ে রহমত

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে 'মানবজাতির জন্য রহমত' বলেছেন-

وَمَا أَرْ سَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

'আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।'
(সূরা আম্বিয়া: ১০৭)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات.

যে আমার উপর একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং দশটি দরজা বুলন্দ হবে।
(মুসনাদে আহমদ)

খাতামুল আম্বিয়া

রাসূলুল্লাহ (সা.) যে আল্লাহর প্রেরিত শেষনবি, তা বিশ্বাস করা ইসলামের অপরিহার্য দাবি। কুরআনে বর্ণিত আছে-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا -

'(মুহাম্মাদ) তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষনবি। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।' (সূরা আহযাব : আয়াত ৪০)

এজন্যই উলামায়ে কেরামগণ বলেছেন, যারা নবীজিকে শেষ নবি হিসেবে বিশ্বাস করে না, তারা কাফের। যেমন: কাদিয়ানীরা কাফের।

উম্মাহর নেতা

নির্যাতনের একপর্যায়ে মহান আল্লাহর নির্দেশে মাতৃভূমি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন প্রিয় নবিজি। মদিনায় হিজরতের পর সবাই তাঁকে গ্রহণ করল এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতা হিসেবে। এরপর তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে সবার সামনে মদিনা সনদ তথা সংবিধান প্রণয়ন করলেন। এই সনদের মাধ্যমে সেখানকার মুসলিম অধিবাসী, হিজরতকারী এবং ইসলামের জন্য যারা সংগ্রাম করছে, তাদের একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। মূলত সেই সম্প্রদায়কেই বলা হয় 'উম্মাহ'। পরবর্তী সময়ে 'উম্মাহ' শব্দটি বিশ্বব্যাপী মুসলিম ভ্রাতৃত্বের জন্য প্রয়োগ করা হয়।

'মদিনা সনদ' ইসলামের প্রথম রাজনৈতিক ব্যবস্থা লিখিত রূপ। এই সনদ নবিজিকে সমাজের প্রধান নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ইহুদি-নাসারারাও সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, দ্বন্দ্বের মীমাংসা এবং বহিরাগতদের আক্রমণ থেকে

নিরাপদ থাকার জন্য তাঁকে মেনে নিয়েছিল। তারা জানত-একমাত্র তিনিই এর উপযুক্ত ব্যক্তি।

একজন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা.) সামাজিক রীতিনীতিকে বিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। তিনি কুরআনের আলোকে আইন প্রণয়ন করে তা প্রয়োগ করতেন। সৈন্যবাহিনী তৈরি করে তাদের বিভিন্ন অভিযানে যাওয়ার নির্দেশনা দিতেন। আর যখন নতুন কোনো এলাকা জয় করতেন, তখন সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে তা পরিচালনা করতেন।

পরামর্শদাতার মতামত তাঁর নিজের মতামতের চেয়ে উত্তম হলে তিনি তা নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন। সিরাতগ্রন্থগুলো পর্যবেক্ষণ করলে এর অহরহ বর্ণনা পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে চুক্তি, গনিমত বণ্টন, সৈন্যদের অস্ত্র কেনা, গভর্নর ও বিচারক নিয়োগ, দ্বন্দ্ব মিটমাট, দূতদের পাঠানোর খরচ, অধ্যাদেশ দেওয়া, ইসলামে আসা নতুন মুসলিমদের সমস্যা নিষ্পত্তি, শরিয়াহর আলোকে আইন প্রণয়ন, দোষীদের শাস্তি দেওয়া, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান, নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের দেখভাল করাসহ যাবতীয় বিষয় তাঁকে তত্ত্বাবধান করতে হতো।

আল্লাহর রাসূল (সা.) দূরের অঞ্চলগুলোতে সাহাবিদের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করে সেখানকার সবকিছুর দায়িত্ব তাঁদের হাতেই ন্যস্ত করতেন। কিন্তু মদিনা ও মদিনার আশেপাশের অঞ্চলে দায়িত্ব পালন করতেন তিনি নিজেই। এই দায়িত্বগুলো ছিল তাঁর জন্য শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে যথেষ্ট চাপের! তবুও তিনি বিরামহীন পরিশ্রম করে যেতেন।

আরবের সমস্ত ধনসম্পদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পদতলে থাকা সত্ত্বেও সামান্য আরামের জন্য তাঁর ছিল না কোনো নরম বিছানা। তিনি না খেয়েছেন তৃপ্তিকর খাবার, আর না ছিল তাঁর কোনো রাজকীয় ঘর। ধনসম্পদের কোনো রকম

বাহাদুরি ছাড়াই কেবল ভালোবাসা দিয়ে মানুষের মন জয় করে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন আজীবন। ইতিহাসের পাতা এর সাক্ষী।

প্রধান বিচারক

রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর দেওয়া কুরআন, সুন্নাহ ও শরিয়াহর আলোকে আইন প্রণয়ন করে সে মোতাবেক বিচারকার্য পরিচালনা করার নির্দেশ দেন। এর নাম 'ইসলামি শরিয়াহ'। মদিনা ও আশেপাশের বিচারকার্য তিনি নিজেই করতেন। অন্যান্য অঞ্চলে সাহাবিদের কাজি বা গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করে পাঠাতেন। সেখানকার বিচারকার্য তাঁরাই করতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিচারিক ফয়সালার পরিমাণ এত বেশি ছিল, সেসব একত্রিত করে বিশাল আকারের একটি গ্রন্থ প্রস্তুত করা সম্ভব। তিনি তাঁর নিয়োগকৃত বিচারকদের বিচারকার্যে সহানুভূতিশীল ও ক্ষমাশীল হওয়ার পরামর্শ দিতেন। হাদিসে এসেছে-

'মুসলমানদের ওপর নির্ধারিত শাস্তির চাপ যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা উচিত এবং যদি কোনো উপায় থাকে, তবে একজন মানুষকে ছেড়ে দেওয়ার কারণ খোঁজা দরকার। কারণ, একজন নেতার জন্য কাউকে শাস্তি দেওয়ার চেয়ে ক্ষমা করা ভালো। (তিরমিজি:৩৫৪০)

শিক্ষক ও পরিচালক

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মানবজাতির জন্য শিক্ষক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কুরআনে বর্ণিত আছে-

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

'আমি তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, মিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তোমাদের পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। আর তোমাদের শিক্ষা দেন এমন কিছু, যা তোমরা জানতে না।'
(সূরা বাকারা: ১৫১)

সিরাতের মাধ্যমে তাঁর জীবনী এবং হাদিসের মাধ্যমে তাঁর বাণী সাহাবিদের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছিল, যা পরবর্তী সময়ে বইয়ে রূপান্তর করা হয়। এই সিরাত ও হাদিস যুগের পর যুগ মানুষকে আলোকিত করে আসছে। আজও নবিজির শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে এবং সন্দেহাতীতভাবে ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে।

'মক্কা ও মদিনা; দুই এলাকায় তাঁর দুই ধরনের ভূমিকা ছিল। মক্কায় থাকাকালীন মুসলিমরা ছিল নির্যাতিত। তাদের ওপর নির্মম অত্যাচার করা হতো। এমনই এক পরিবেশে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াতি কাজ করতেন। যদিও মুসলিমদের নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল, তবু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা তাঁদের টিকে থাকার বড়ো উৎস হিসেবে কাজে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তে থাকলে তিনি সবার সামনেই সাহাবিদের শিক্ষাদান করতেন।

মদিনায় মুহাজির ও আনসার; দুই দলের জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) হয়ে ওঠেন একমাত্র নেতা। মসজিদ ছিল তৎকালীন শিক্ষালয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে নববিতে বসেই সকলকে শিক্ষাদান করাতেন। একপর্যায়ে তা ইসলামের শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে তা ছড়িয়ে দেওয়া হতো মুসলিম বিশ্বের নানান প্রান্তে। এটাই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর তিনি সাহাবিদের সাথে বসতেন এবং তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। মহিলাদের জন্যও সপ্তাহে এক দিন বৈঠকের ব্যবস্থা ছিল। এই প্রচেষ্টা ছিল অত্যন্ত সফল ইসলামি শিক্ষার বিপ্লবী সূচনা।

একটি হাদীসে এসেছে- নবিজি একদিন মসজিদে প্রবেশ করে সাহাবিদের দুটি দলে বিভক্ত হয়ে বসে থাকতে দেখলেন। প্রথম দল ছিলেন আল্লাহর ইবাদত ও জিকিরে মনোযোগী। আর দ্বিতীয় দল একজন আরেকজনের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ইলম অর্জন করে নিচ্ছিলেন। নবিজি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন- "সকলেই কল্যাণকর তৎপরতায় রত আছে। কিন্তু আমি শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি। এ কথা বলে তিনি দ্বিতীয় দলের সমাবেশে বসলেন। (ইবনে মাজাহ)

সাহাবিদের জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাদানে অনুপ্রাণিত করতে নবিজি কুরআনকে সামনে তুলে ধরতেন। পড়াশোনা ও জ্ঞানার্জনকে উৎসাহিত করে কুরআনের প্রথম নাজিলকৃত আয়াত হলো-

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم -

'পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে "আলাক" থেকে। পড়ো, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।' সূরা আলাক: ১-৫

উম্মি নবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর সাহাবিদের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে শিখিয়েছিলেন। তাঁদের শিখতে ও শেখাতে অনুপ্রাণিত করে তা অন্যদের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর সাহাবিগণ পূর্ণ উদ্যমে ইসলামের বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দেন।

মিলিটারি কমান্ডার

মদিনায় হিজরত করলেন নবিজি। এতে মক্কা থেকে আগত সাহাবিদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধ হলো। কিন্তু থেমে থাকল না কুরাইশদের ষড়যন্ত্র। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলিমদের ধ্বংস করে দিতে চাওয়া কুরাইশদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সশস্ত্র সংঘর্ষ বেঁধে গেল। নবিজি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করতে লাগলেন, যেন শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। এ সময়ই আল্লাহ মুসলিমদের আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে ওহি নাজিল করলেন-

'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদের, যাদের আক্রমণ করা হচ্ছে। কারণ, তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের বিজয়দানে সক্ষম। যাদের তাদের নিজ বাড়ি-ঘর থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা বলে-"আমাদের রব আল্লাহ।""
(সূরা হজ: ৩৯-৪০)

রাসূলুল্লাহ (সা.) ৬৪টি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। আর এর মধ্যে ২৬টিতে স্বয়ং তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। নবিজি বেশি অভিযানে না যাওয়ার কারণ হিসেবে বলেছেন- 'আল্লাহর কসম! যদি আমি এটাকে মুসলমানদের জন্য কষ্ট মনে না করতাম, তাহলে প্রতিটি সামরিক অভিযানে যাওয়া থেকে বিরত থাকতাম না। কিন্তু আমার কাছে যথেষ্ট বাহন নেই। '(হায়াতুস সাহাবা)

বদরের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ, বনু নাজিরকে উৎখাত, আহজাবের যুদ্ধ, বনু কুরাইজার বিরুদ্ধে অভিযান, হুদাইবিয়ার সন্ধি, খায়বারের যুদ্ধ, মুতার যুদ্ধ, মক্কা বিজয়,হুনাইনের যুদ্ধ এবং তাবুকের মতো প্রখ্যাত যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন।এই অভিযানগুলোর ফলাফল হিসেবে সমস্ত আরবে ইসলাম কায়েম হয়।

তিনি সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার সাথে সাথে মুজাহিদদের নৈতিক আচরণ ও আধ্যাত্মিকতার দিকে লক্ষ রাখতেন, যা ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। মুজাহিদদের তিনি ইসলামি শরিয়াহ অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দেন; এমনকি তিনি শত্রুদের প্রতি একটুও রূঢ় ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.)-কে সিরিয়া অভিযানে প্রেরণ করার সময় আবু বকর (রা.) তাকে এই বলে উপদেশ দেন-

'আমি তোমাকে ১০টি উপদেশ দিচ্ছি-কোনো মহিলা, শিশু কিংবা বৃদ্ধ বয়সের কাউকে হত্যা করবে না। ফল দেয় এমন গাছ বিনা কারণে কাটবে না। কোনো বাসস্থান ধ্বংস করবে না। খাওয়া ব্যতীত কোনো মেষ কিংবা উটকে জবেহ করবে না। মৌচাকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাদের বিক্ষিপ্ত করবে না। গনিমত থেকে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখবে না এবং কাপুরুষ হবে না। '

রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে 'দুর্দান্ত মিলিটারি কমান্ডার এবং চৌকশ কৌশলবিদ' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। গুপ্তচরের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর কৌশল নির্ধারণ করতেন। এটা তাঁর দুর্দান্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। বরাবরই শত্রুদের জানান দিয়ে সামনে থেকে আক্রমণ করতেন। তবে কদাচিৎ আচমকা আক্রমণ করতেন। দুভাবেই সফল হয়েছেন। মাঝেমধ্যে শত্রুদের অবাক করে দিয়ে আগেভাগে আক্রমণ করে বসতেন।

এসব সম্ভব হয়েছিল তাঁর যুদ্ধের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার কারণে। তাঁর দলে ছিল বাঘাবাঘা দুর্দান্ত যোদ্ধা, যারা মরুর বুকে দাঁপিয়ে বেড়াতেন। তিনি তাঁর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য গোপন রেখে ময়দানে যেতেন, এতে সহজে কেউ তাঁর গন্তব্য কিংবা

উদ্দেশ্য টের পেত না। এই শিক্ষাগুলো তাঁর অনুসারীদের শৃঙ্খলবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল। আর সাথে ছিল আল্লাহর সাহায্য। ফলে এক মাসের পদযাত্রার দূরত্বে থাকা প্রতিপক্ষের হৃদয়ে ভীতি ছড়িয়ে পড়ত।

আমেরিকান মিলিটারি ইতিহাসবিদ রিচার্ড গ্যাব্রিয়েল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামরিক দক্ষতার প্রশংসা করে বলেন-'তিনি সত্যিই একজন শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক ছিলেন। এক যুগের মধ্যেই তিনি আটটি বড়ো বড়ো যুদ্ধ করেন। ১৮টি অভিযান এবং আরও ৩৮টি সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা, যেগুলোর নেতৃত্ব তিনি সরাসরি দেননি; সেসব যুদ্ধের পুরো কলাকৌশল তিনিই ঠিক করে দিয়েছিলেন। যুদ্ধে দুবার আহত হয়েছিলেন। প্রতিপক্ষের দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়েও যুদ্ধে দাবার গুটি পালটে দিয়ে তাঁর অনুসারীদের বিজয় উপহার দিয়েছিলেন বহুবার।

তিনি শুধু কৌশলী ও ময়দানের সেনানায়ক নন; একই সঙ্গে সামরিক তাত্ত্বিক, সাংগঠনিক সংস্কারক, কৌশলী কমান্ডার, রাজনৈতিক-সামরিক নেতা, বীর সৈনিক এবং একজন বিপ্লবীও ছিলেন। তিনি হলেন বিদ্রোহ যুদ্ধের আবিষ্কারক এবং ইতিহাসের সফল পরিকল্পনাকারী। '(Richard A Gabriel. Muhammad: The Warrior Prophet.)

নবুয়তের আগে সংঘটিত হওয়া ফিজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কিছুটা হলেও যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। আরবের একের পর এক অঞ্চল বিজয়ের সর্বাধিনায়ক রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই ছিলেন। গ্যাব্রিয়েল বিশ্বাস করেন-মুহাম্মাদ (সা.) যদি আরবে সামরিক বিপ্লব না আনতেন, তাহলে হয়তো ইসলাম নিজেও আরবে টিকে থাকত না।

২৫ বছর ধরে ব্যাবসা-বাণিজ্য করার ফলে পরিকল্পনা ও রসদ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। এগুলো ছিল তাঁর জন্য সহায়ক শক্তি। তিনি একটি সমন্বিত সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন, যারা যুদ্ধের পরিকল্পনা ও নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে ছিলেন অত্যধিক আত্মবিশ্বাসী। ফলে সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি

পেতে থাকে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো-নবিজি ও ইসলামের প্রতি সাহাবিদের অটল বিশ্বাস ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-
'যুদ্ধ কেবল একটি বিজয়ী কৌশল বা একটি ভালো পরিকল্পনা।
(বুখারী:২৬৯)

তিনি উত্তম কৌশল ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনার ওপর জোর দিয়েছিলেন। গ্যাব্রিয়েল আরও বলেন- 'মুহাম্মাদ প্রথমদিকে ছোটো একটি গেরিলা বাহিনী তৈরি করেছিলেন। এই বাহিনী তাৎক্ষণিক আক্রমণ চালিয়ে সরে পড়ার মতো যথেষ্ট শক্তিধর ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাঁর দলের অনুসারী বাড়তে থাকে। আর এক দশক পর যখন তিনি মক্কা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হলেন, তখন সেই ছোটো গেরিলা বাহিনী বৃহত্তর সেনাবাহিনীতে পরিণত হলো। এই সমন্বিত অশ্বারোহী বাহিনী এবং পদাতিক সৈন্যদলেরা বড়ো আকারের যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করতে সক্ষম ছিল। এটি ছিল আরব ইতিহাসের প্রথম কোনো জাতীয় সামরিক বাহিনী। ফলে সামরিক অস্ত্র ব্যবহার করে তাঁর অনুসারীরা একটি মহান সাম্রাজ্য তৈরি করতে পেরেছিলেন।'

একের পর এক সামরিক অভিযানে সৈন্যসংখ্যা যে জ্যামিতিক হারে বাড়ছিল, তা সৈন্যসংখ্যা দেখলে স্পষ্ট হয়ে যাবে। বদর যুদ্ধে ৩১৩ জন (৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ), উহুদ যুদ্ধে ১ হাজার (৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ), খায়বারের যুদ্ধে ২০ হাজার (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ), মক্কা বিজয়ে ১০ হাজার (৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ), হুনাইন যুদ্ধে ১২ হাজার (৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ), এবং তাবুক যুদ্ধে ২০-৩০ হাজার জন (৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ)।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাহিনী শত্রুদের মুখোমুখি হতে গিয়ে ভয়ংকর প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতেন। কারণ, শত্রুসংখ্যা তাদের চেয়ে কমপক্ষে তিনগুণ বেশি ছিল। অনুপাত করলে ৩: ১ -এ এসে দাঁড়ায়। বদরে ৩১৪ বনাম ১ হাজার; উহুদে ১ হাজার বনাম ৩ হাজার; আহজাবের যুদ্ধে ৩ হাজার বনাম ১০ হাজার ৮২।

সাহাবিদের শক্তি আর সাহসের উৎস ছিল কেবল আল্লাহর প্রতি সীমাহীন ভরসা আর রাসূল (সা.)-এর সম্মোহনী নেতৃত্ব। কুরআনে আল্লাহ ওয়াদা করে বলেন-

'অতএব, যদি তোমাদের মধ্যে ১০০ জন ধৈর্যশীল থাকে, তাঁরা ২০০ জনকে পরাস্ত করবে এবং যদি তোমাদের মধ্যে এক হাজারজন থাকে, তাঁরা আল্লাহর হুকুমে দুই হাজারজনকে পরাস্ত করবে এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।' (সূরা আনফাল: ৬৬)

শত্রুদের বিশালসংখ্যক সেনা থাকলেও এত কম সময়ে মুসলিমদের একের পর এক বিজয় অর্জনই প্রমাণ করে-মুহাম্মাদ (সা.) হলেন আল্লাহর প্রেরিত শেষনবি ও রাসূল এবং আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম। তাই বলতে পারি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি বা মিলিটারি কমান্ডার হলেন মুহাম্মাদ (সা.)।

কাইন্ডফুল লিডার

একজন নেতার ক্ষমা কেমন হওয়া উচিত, নিচের আয়াতটি তা জানিয়ে দেয়-

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

'তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদের ক্ষমা করো এবং তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো। আর কাজকর্মে তাদের সাথে পরার্মশ করো। অতঃপর যখন সংকল্প করবে, তখন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।'
(সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)

নবুয়তের ১০ বছর পর নবিজি তাঁর সাহাবিদের নিয়ে মক্কা বিজয় করলেন। অতঃপর অগ্রসর হলেন তায়েফের দিকে। এর আগে ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তায়েফবাসীকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে গেলেন, কিন্তু তারা তাঁকে গ্রহণ করেনি; বরং ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের পাথরের আঘাতে তাঁহার ও জায়েদ ইবনে হারিসা (রা.)-এর শরীর রক্তাক্ত হয়েছে। এমন অবস্থায়ও তিনি আল্লাহর দিকে হাত তুলে দুআ করে বললেন-

'হে আল্লাহ! আমার অক্ষমতা ও সহায়-সম্বলহীনতা এবং মানুষের কাছে আমার নগণ্যতার জন্য আমি আপনারই কাছে ফরিয়াদ করছি। হে পরম দয়াময়! আপনি দুর্বলদের প্রতিপালক। আপনি আমার রব। আপনি আমাকে কার হাতে সোপর্দ করেছেন? আমার প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করে, সেই অনাত্মীয়ের হাতে? নাকি সেই শত্রুর হাতে, যাকে আমার ওপর কর্তৃত্ব দান করেছেন? আমার প্রতি যদি আপনার অসন্তুষ্টি না থাকে, তবে আমি কোনো কিছুর পরোয়া করি না। আপনার প্রদত্ত নিরাপত্তাই আমার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। আমার প্রতি আপনার ক্রোধ কিংবা অসন্তুষ্টি থেকে আমি আপনার নুরের আশ্রয় চাই, যা দ্বারা সকল অন্ধকার তিরোহিত হয়ে যায় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্যাসমূহের সুরাহা হয়।

সবকিছুর শেষ পরিণাম আপনিই। আপনি ছাড়া আর কারও ক্ষতি প্রতিহত করার এবং উপকার করার ক্ষমতা নেই। '৯২

একটি আঙুর বাগানে বিশ্রাম নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও জায়েদ (রা.) রওনা দিলেন মক্কার দিকে। পথে 'কারনে মানাজেল' নামক স্থানে তাঁরা থামলেন। সেখানে আল্লাহর হুকুমে জিবরাইল (আ.) এলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতারা। জিবরাইল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললেন-'আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং যে আচরণ করেছে, আল্লাহ সবকিছু শুনেছেন এবং দেখেছেন। এখন তিনি পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতাগণকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করেছেন। আপনি তাঁদের যা ইচ্ছে নির্দেশ প্রদান করুন।'

এরপর পর্বতের ফেরেশতারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সালাম দিয়ে বললেন-'হে মুহাম্মাদ (সা.)! কথা একটাই, আপনি যদি চান এদের আমরা দুই পাহাড় একত্রিত করে পিষে মারি, তাহলে তা-ই হবে।' আমাদের নবি যে সত্যই রহমতের নবির উদাহরণ, এই ঘটনা তার বড়ো নজির। আসুন আমরা দেখি, কী ছিল তাঁর উত্তর? রাসূলুল্লাহ (সা.) তারপর বললেন-

'না, বরং আমার আশা-মহান আল্লাহ এদের পৃষ্ঠদেশ হতে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন, যারা একমাত্র তাঁর ইবাদত করবে এবং অন্য কাউকেই তাঁর অংশীদার ভাববে না। '
(বুখারী : ৩০৫৯)

আহত শরীর আর ভগ্নহৃদয় নিয়েও তিনি প্রতিশোধের চিন্তা করেননি। সীমাহীন ঔদার্যের নজরানা স্থাপন করে ক্ষমাশীল হৃদয় নিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দুআ করলেন, যারা এক আল্লাহতে বিশ্বাস আনবে। পরবর্তী সময়ে আয়িশা (রা.) একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন-'উহুদের চেয়ে আপনার জীবনে কঠিনতম দিন এসেছিল কি?' তিনি বললেন- 'হ্যাঁ, তায়েফের ঘটনা।'

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর এই ক্ষমার গুণাবলিই অনুসারীদের মধ্যে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করে গেছেন জীবনভর। হাদিসে আছে-

'অবশ্যই আল্লাহ দয়াশীল, তিনি দয়াশীলদের ভালোবাসেন। যে কঠোরতা অবলম্বন করে না, তাঁকে আল্লাহ উপহার দান করেন। '
(বুখারী : ৫৯২৭)

আরেকটি হাদিসে আছে-

'যখন দয়া দেখানো হয়, তখন তা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আর যখন দেখানো হয় না, তখন তা পরিস্থিতি নষ্ট করে দেয়। '
(মুসলিম : ২৫৯৪)

মক্কা বিজয়ের পর মুয়াজ (রা.)-কে ইয়েমেনে পাঠানো হলো। পথমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে উপদেশ দিলেন-
নম্র থাকবে, কঠোর হবে না। মানুষের কাছে সুসংবাদ পৌঁছে দেবে। যখন ইহুদি-খ্রিষ্টানরা তোমার কাছে আসবে, তখন তাঁরা তোমাকে "জান্নাতের চাবি কী?" জিজ্ঞেস করবে। বলবে-“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই।

দ্যা আল্টিমেট লিডার

পবিত্র কুরআন নাজিলের অন্যতম প্রধান একটি উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ভুল বিশ্বাস ও কর্মের অন্ধকার হতে ঈমান ও সৎকর্মের আলোয় নিয়ে আসা। কুরআনে বলা হয়েছে-

الرٰ كِتٰبٌ أَنْزَلْنٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

'আলিফ লাম র; এই কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাজিল করেছি, যেন তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনো পরাক্রমশালী সর্বপ্রশংসিতের পথের দিকে।'
(সূরা ইবরাহিম: ১)

কুরআনের বাণীর মাহাত্ম্য সমাজে প্রচারের মাধ্যমে নবিজি আরব সমাজে এমন পরিবর্তন এনেছিলেন, যা বিশ্বের দূরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ অবধি তা মানবসভ্যতাকে নির্দেশনা প্রদান করছে।

নবিজির সমাজ সংস্কারের ব্যাপকতা উপলব্ধির জন্য আমরা সংক্ষিপ্তভাবে নবুয়তপূর্ববর্তী আরব সমাজ নিয়ে পর্যালোচনা করব। মূলত ঘুণে ধরা ওই সমাজব্যবস্থাই স্বয়ং তাঁকে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়েছিল। নবুয়তপূর্ববর্তী এ সময়টিকেই জাহেলিয়াতের সময় হিসেবে গণ্য করা হয়।

তৎকালীন আরবরা ছিল সংকীর্ণমনা, বস্তুবাদী ও আবেগপ্রবণ। মদ্য পান ও জুয়া খেলেই তাদের সময় কাটত। আর বিনোদনের অন্যতম উপকরণ ছিল আন্তঃগোত্রীয় দ্বন্দ্ব ও খুনাখুনি। এসব তাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার বলে পরিগণিত হতো। মেয়ে সন্তানকে তারা নিজেদের জন্য মনে করত অশুভ। তাই তাদের জীবন্ত দাফন করতেও কোনো প্রকার আবেগ তারা অনুভব করত না।

বেদুইন নারীরা এতটাই মর্যাদাহীন ছিল, গবাদি পশুর বিনিময়ে তাদের বেচাকেনা করা হতো। একজন পুরুষ যতজন ইচ্ছা স্ত্রী রাখতে পারত। জোরজবরদস্তি করে সম্পত্তির দখল কিংবা তুচ্ছ কারণে খুনাখুনি ছিল হাতের মোয়া। প্রকাশ্য দিবালোকে তারা এসব করে বেড়াত। কিন্তু তাদের মধ্যে গোত্রীয় আনুগত্যের চর্চা ছিল মারাত্মক পর্যায়ে, যা দিনশেষে যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াত। ২৯৬ মূলত তৎকালীন আব্রাহামিক ধর্ম তথা ইহুদি ও খ্রিষ্টীয় ধর্ম বিকৃত হয়ে যাওয়ায় সমাজ থেকে নৈতিকতা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

জাহেলি চেতনার দুটি বৈশিষ্ট্য জাগতিকতা ও গোত্রবাদ আমাদের অনুসন্ধানের সাথে প্রাসঙ্গিক। পৌত্তলিক আরবদের কাছে দুনিয়াই ছিল একমাত্র জগৎ। আখিরাতের অনন্ত জীবনকে তাঁরা অবিশ্বাস করত। প্রাক-ইসলামপূর্ব কবিদের রচনাগুলো তাই পূর্ণ থাকত মানবজীবনের নানা অপ্রাপ্তির শূন্যতা ও হতাশার তিক্ত আর্তনাদ দ্বারা।

ইসলামি তাওহিদ আরবের পৌত্তলিক বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। নবিজি পুনরুত্থান ও পরকালের জীবন সম্পর্কিত আল্লাহর যে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন, তা তারা ঘৃণা ও উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছিল। কুরআনের ভাষায়-

قَالُوا وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَ عِظَامًا ءَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ - لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هُذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

'তারা বলে-"যখন আমরা মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? অবশ্যই আমাদের ও ইতঃপূর্বে আমাদের পিতৃপুরুষদের এই ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। এসব কেবল পৌরাণিক উপাখ্যান ছাড়া আর কিছু না।"
(সূরা মুমিনুন: ৮২-৮৩)

প্রাক-ইসলামি আরবের সামাজিক কাঠামো মূলত ছিল গোত্রভিত্তিক। গোত্রীয় সম্মান ব্যতীত অন্যকিছুতে কোনো সম্মান ছিল না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর

দাওয়াতে রক্তের বন্ধনের চাইতে ধর্মীয় সম্পর্কের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে এক এবং একমাত্র আল্লাহতে বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে একটি সম্পূর্ণ নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আর তাই মদিনায় হিজরতের পর ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে বিশ্বাসীদের দাঁড় করিয়েছিলেন একই কাতারে।

ইসলামপূর্ব যুগে এত সব অনাচারের পাশাপাশি আরবদের বেশ কিছু প্রশংসনীয় গুণাবলিও ছিল। কুরআনে সেগুলোর বর্ণনা এসেছে। জাহেলি যুগের সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর উদারতা, সাহসিকতা, মহানুভবতা, বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতাকে একীভূত করার মাধ্যমে তাদের শুদ্ধ ও সতেজ করেছেন। আলি (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যথার্থ মন্তব্য করেন-

'তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উদার, সবচেয়ে দৃঢ় হৃদয়ের, সবচেয়ে সত্যবাদী, আমানতের দেখভালে সবচেয়ে বিশ্বস্ত, মনের দিক দিয়ে সবচেয়ে শান্ত ও বন্ধুত্বপূর্ণ, মেলামেশায় সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। যারা অপরিচিত হওয়ার কারণে তাঁকে প্রথমে দেখে ভয় পেত, তাঁরাও পরিচিত হওয়ার পর তাঁকে প্রাণপণে ভালোবাসত। সত্যিই তাঁর মতো মানুষ আমি আর দেখিনি।'

মূর্তিপূজা, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা পূর্ববর্তী নবিদের শিক্ষাগুলো সমাজ থেকে মুছে দিয়েছিল। ফলে মুহাম্মাদ (সা.)-কে যে তাঁর মিশন বাস্তবায়ন করতে এক বিশাল বাধার মুখোমুখি হতে হবে, এ ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন। ইতিহাসের কোনো মানুষই তাঁর ক্ষমতার বাইরে এসে এতদূর পর্যন্ত কোনো কাজ করতে পারেননি। অবাক লাগে - মরুভূমিতে থাকা একজন মানুষ কোনো যন্ত্র বা অগণিত মানুষের সাহায্য ছাড়া কিছু মুষ্টিমেয় লোককে নিয়ে সমাজ পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন!

উপসংহার

মানবেতিহাসের শ্রেষ্ঠ গুণে গুণান্বিত মানুষ মুহাম্মাদ (সা.)। তাঁর অনুপম নেতৃত্বে ইসলামপূর্ব জাহেলি সমাজ পরিবর্তিত হয়ে সভ্যতার এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে অদ্যাবধি বৈশ্বিক প্রভাব বজায় রেখেছে। একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে নবিজি ছিলেন সুদক্ষ। ব্যবস্থাপক হিসেবেও তাঁর কোনো জুড়ি ছিল না। যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতি হিসেবে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সর্বোপরি নেতৃত্বের প্রসঙ্গে নবিজি ব্যতীত প্রকৃষ্ট কোনো উদাহরণ নেই পুরো পৃথিবীতে; হবেও না কখনো। কেননা, তিনিই তো নেতৃত্বের সব গুণের আধার।
কেবল তিনিই আমাদের আদর্শ নেতা। তাঁহার অনুসরণ ই মানব মুক্তির একমাত্র পন্থা।

মহান আল্লাহ পাক বলেন -

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর আর রসূলের আনুগত্য কর আর তোমাদের আমালগুলোকে নষ্ট করে দিও না।
(সূরা মুহাম্মদ : আয়াত ৩৩)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

আমার সকল উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে। তারা বললেন, কে অস্বীকার করবে। তিনি বললেনঃ যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার করবে।
(বুখারী :৭২৮০)

যারা আল্লাহকে ভালোবাসে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে অনুসরণ করে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তাদের গুনাহও মাফ করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

''বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।'' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩১)

পরিশেষে একটি হাদীস –

আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই। (বুখারী : ১৫)